★ পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসী সরকারের ★ জনস্বার্থ রক্ষার নমুনা

রীব জনতার ঘাড়ে ট্যাক্সের বোঝা, আর নিজেদের পকেটে মোটা বেতন

গণদাবী

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জী

১ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা] ৩রা মাঘ মঙ্গলবার, ১৩৫৫, ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯ [মূল্য—দুই আনা

পশ্চিমবাংলা কংগ্রেসী সরকার নতুন করে আর এক শোষণের ীস করভারে প্রপীড়িত পশ্চিম-বাংলার অধিবাসীদের গলায় পরিয়ে দিয়েছে ংশোধিত বিক্রয় কর হিসেবে। এর আওতায় আসবে জনসাধারণের নিত্য বহার্য্য জিনিষপত্র যেমন—সরিষার তেল, রাই সরিষার তেল, সরিষা ও রাই মিশ্রিত তেল, সরিষা ও রাই বীজ, দিয়াশলাই, তামাক, কাঁচা কয়লা, জ্বালানী য়লা, কয়লার গ্যাস, তাজা ফল, হাতে তৈরী কাগজ, জ্বালানী কাঠ, কাঠ-য়লা, তাঁতের কাপড়, চামড়া, খবরের কাগজ, ও কুইনাইন। যে লীগ মন্ত্রী-ণ্ডলীকে বাংলার জনসাধারণ ক্লাইভ ষ্ট্রীটের ইংরেজ প্রভুদের জো-হুকুমের দল, স্বরাচারী বলে অভিহিত করেছে সেই লীগ মন্ত্রী-মণ্ডলীই এই জিনিষগুলিকে বিক্রয় করের আওতা হতে বাদ দিয়েছিল। আর বর্ত্তমানে স্বাধীনতা পাবার পর অন্ততঃ নেতারা এই কথা বলে আসার পর জনসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ওপর নতুন করে কর-ভার চাপান, শুধু চাপান নয়, বর্ত্তমান হারের চেয়ে বর্দ্ধিত হার চালু করা নেতাদের গালভরা স্বাধীনতার রূপ ভালভাবে প্রকাশ করে দিল।

অন্যদিকে ভারত সরকারের প্রচার বিভাগ থেকে আরম্ভ করে প্রা-দেশিক প্রচার বিভাগ মায় গ্রামাঞ্চলের ধুঁদে সরকারী প্রভু ও কংগ্রেস কর্ত্তারা প্রচার করে চলেছে জনসাধারণের নিদারুণ দুঃখ দুর্দ্দশার কথা ভারতসরকারের জানা আছে এবং সেই কারণে যাতে জন-সাধারণের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির দাম কমে তার জন্য ভারত সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে আর অন্য দিকে ঠিক সেই সময় নিত্য নতুন কর ভারতীয় জন-সাধারণের ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এ অবস্থা চলে। শোষণ এখানে চলে যখন এক-দিকে তখন সেই শোষণের জ্বালায় জনতা পাছে বিদ্রোহ করে বসে সেই ভয়ে জ্বালার ওপর মিষ্ট কথার প্রলেপ দেওয়া হয়। ভাল ভাল প্রতিশ্রুতি আর অঙ্গীকারের প্রচার চলে পুরোদমে। এই হল বর্ত্তমান শোষণের কৌশল। পুঁজিপতিরা এবং তাদের সরকার পরিষ্কার ভাবে জানে যে আজকে নিছক গায়ের জোরে শোষণ করতে গেলে জনসাধারণ ক্ষেপে যাবে তাই ভুল বুঝিয়ে, ঘুম পাড়িয়ে শোষণ তারা চালায়।

জন উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য এই কর—মন্ত্রী-মণ্ডলীর এই কথা মিথ্যা

২৪শে জানুয়ারী পশ্চিম-বাংলার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ব্যবস্থা-পরিষদে বিলটি উত্থাপন করার সময় জানান যে কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রদেশে কতকগুলি উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্য্য-করী করার জন্য ১৯৪৮-৪৯ সালে ৬॥ কোটি টাকা সাহায্য করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। সেই প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন পরিকল্পনা রচিত হয় এবং তা কার্য্যে পরিণত করার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এখন কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে ১৯৪৮-৪৯ সালে ২ কোটি এবং ১৯৪৯-৫০ সালে ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার বেশী দিতে পারা সম্ভব নয় বলে জানান হয়েছে। যেহেতু উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি বন্ধ রাখা যুক্তি-যুক্ত নয় এবং বন্ধ রাখলে যা ব্যয়িত হয়েছে তার অধিকাংশই ব্যর্থ হয়ে যাবে সেই হেতু পশ্চিম বাংলা সরকার পরিকল্পনাগুলি বাস্তবে রূপায়িত করতে স্থির করেছে। এই কারণে এ বছর বাজেটে বিরাট ঘাটতি দেখা যাবে। এই ঘাটতি পূরণের জন্যই মন্ত্রীমণ্ডলী বাধ্য হয়ে কর বাড়িয়ে রাজস্ব বৃদ্ধির চেষ্টা করেছে। এই হল পশ্চিম-বাংলা সরকারের বক্তব্যের সার মর্ম্ম।

এখন দেখা যাক কথাগুলি কতদূর সত্য। গত বছর ফেব্রুয়ারী মাসে পশ্চিম-বাংলা সরকারের ১৯৪৮-৪৯ সালের বাজেট উপস্থিত করার সময় অর্থসচিব শ্রীনলিনী রঞ্জন সরকার জাতিগঠনমূলক কাজের দরুণ মোটা অর্থ ব্যয় করার প্রস্তাব করেছিলেন। ঐ সব পরিকল্পনার মধ্যে কতকগুলি পশ্চিম-বাংলা সরকারের নিজস্ব অর্থে ও কতকগুলি কেন্দ্রের সাহায্যে কার্য্যকরী করার কথা ছিল। পরিকল্পনাগুলির মধ্যে মধ্যবিত্ত লোকেদের বাসস্থান সংস্থানের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাড়ী ঘর তৈরী করা একটি বিষয় ছিল। বাজেটে ঐ বাবদে ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল; অথচ আজ পর্য্যন্ত এই পরিকল্পনার কিছুই হয় নি। এ কথা সম্প্রতি ডাঃ রায় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। এ বরাদ্দ অর্থ ব্যয়িত হল কোন উন্নয়ন খাতে? তার পর গৃহ পালিত পশুর শ্রেণীগত উন্নতির জন্য ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে হরিণঘাটায় একটি গবেষণা ও প্রজনন কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব ছিল তার বা কি হ'ল? শুধু এই দুইটি পরিকল্পনাই নয় আজ পর্য্যন্ত কোন জন-উন্নয়ন পরিকল্পনাই কার্য্যকরী করা হয় নি। আর্থিক বছরের শেষাশেষী নতুন করে অর্থের অভাবে কর বৃদ্ধির অজুহাত দেখানর অর্থ জনসাধারণকে ভুল বোঝাবার চেষ্টা করা সত্যই বুঝি অর্থের অভাবে পরিকল্পনাগুলি অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। বাজেটে ঐ সমস্ত জনউন্নয়ন পরিকল্পনা দেখাবার উদ্দেশ্য জনসাধারণের আস্থা অর্জন করা। এই ভাবে এক দিকে মিথ্যা আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনসাধারণকে শান্ত থাকতে বলা অন্য দিকে পরিকল্পনাগুলিতে বরাদ্দ অর্থ আশ্রিত প্রতিপালন বা ঐ জাতীয় অকাজে ব্যয় করে উপদলীয় প্রভুত্ব ও চক্রান্তকে পশ্চিম বাংলার অধি-বাসীদের ওপর কৌশলে চাপিয়ে রাখা এই হল তথাকথিত স্বাধীন পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসী সরকারের লক্ষ্য।

রাজস্বের সচ্ছলতা—একথা ধাপ্পা

কংগ্রেসী সরকারের মুখে একটি কথা লেগেই আছে—টাকা নেই জন উন্নয়নের কাজ কেমন করে হবে। এ কথাটা একটা প্রকাণ্ড ধাপ্পা তা পশ্চিম বাংলার দৃষ্টান্ত দিলেই প্রমানিত হবে। বাংলা দেশ বিভক্ত হবার পর আয়তন হিসেবে অবিভক্ত বাংলার এক তৃতীয়াংশের মত পড়েছে নবগঠিত পশ্চিম বাংলা প্রদেশে। অথচ ১৯৪৬-৪৭ সালে অবিভক্ত বাংলার সরকারী আয়ের পরিমান ছিল ৩৯ কোটী ৯১ লক্ষ টাকা আর সেই জায়গায় পশ্চিম বাংলার ১৯৪৮-৪৯ সালে বাজেটে আয় বরাদ্দ হয়েছে ৩১ কোটী ১৮ লক্ষ টাকা। সুতরাং আয়তন ও লোক সংখ্যার অনুপাতে রাজস্ব যে অনেক গুণ বেড়েছে তাতে সন্দেহ করার কিছু নেই। সরকারী আয় আপেক্ষিক ভাবে আড়াই গুণের মত বাড়লেও কিন্তু জন-কল্যান ও জাতি গঠনমূলক কাজের খাতে সরকারী খরচ কমেছে বই বাড়ে নি। উদাহরণ হিসেবে দেওয়া যেতে পারে শিক্ষা-বিভাগের ব্যয়। স্বাধীনতা পাবার আগে এবং নেতাদের স্বাধীনতা মেলার

—অন্যান্য পৃষ্ঠায় দেখুন—

—: o :—

- সংগ্রাম ব্যতীত বাঁচার উপায় নাই
- কথা-প্রসঙ্গে
- শ্রমিক নিয়োগ ব্যবস্থা ধনতন্ত্রে ও সমাজতন্ত্রে
- সেণ্ট্রাল পি ডবলিউ-ডি, শ্রমিকদের উপর সরকারী জুলুম
- রেলশ্রমিকদের উপর কংগ্রেসী সরকারের অত্যাচার ও
- অন্যান্য সংবাদ

(৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

সংগ্রাম ব্যতীত বাঁচার উপায় নাই

সমগ্র ভারতবর্ষে আবার নূতন বেগে ধর্ম্মঘটের বন্যা নামিয়া আসিতে যাইতেছে—৯ই মার্চ হইতে সারা ভারতে ডাক ও তার শ্রমিক ও কর্ম্মচারীরা সাধারণ ধর্ম্মঘট ঘোষণা করিয়াছেন; বিভিন্ন রেলওয়ের শ্রমিক ও কর্ম্মচারী ভাইরা ভারতব্যাপী ধর্ম্মঘটের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন; ডক শ্রমিক কর্ম্মচারীরাও নিশ্চেষ্ট হইয়া নাই। এক কথায় নেতাদের স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে শ্রমিক বিক্ষোভ বিরাট এক রূপ পরিগ্রহ করিতে চলিয়াছে। ইহাতে সফল হইতে পারিলে একদিকে যেমন শ্রমিক আন্দোলনকে জোরদার করিয়া তুলিবার যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা মিলিবে অন্যদিকে তেমনই ইহাতে পরাজয় ঘটিলে ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলন এমন কি আইন সঙ্গত ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলন বহুদূরে পিছাইয়া যাইবে এবং শ্রমিক বিক্ষোভ ও অশান্তির ভয়ে যে নগ্ন ফ্যাসিবাদী নিষ্পেষণ ভারতীয় মেহনতী জনতার উপর দিয়া নিষ্করুণ ভাবে চালিত হইতে পারিতেছে না তাহাকেই ডাকিয়া আনা হইবে। অথচ কোন প্রগতিবাদী ব্যক্তি ভারতে সে অবস্থা আসুক তাহা চাহিতে পারেন না। সুতরাং যিনি নিজেকে প্রগতিবাদী বলিয়া পরিচয় দিতে চাহেন তাঁহাকেই দায়িত্ব লইতে হইবে এই বিরাট ধর্ম্মঘটকে সফল সমাপ্তির দিকে লইয়া যাইবার। নিজে ডাক তার বিভাগের কর্ম্মী নই, 'রেল শ্রমিকের দাবী মিটিলে আমার ত মজুরী বাড়িবে না কিংবা ডক মজুরের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই এই ধরণের প্রশ্ন তুলিয়া কর্ত্তব্য হইতে সরিয়া গেলে মারাত্মক ভুল করা হইবে কারণ আগামী ধর্ম্মঘট গুলির সহিত কেবলমাত্র ডাক তার, রেল ও ডক শ্রমিকের ভাগ্যই জড়িত তাহা নহে, পরোক্ষভাবে প্রত্যেকটি জনমানবের ভবিষ্যতই ইহার সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত।

কেমন করিয়া জড়িত তাহা বুঝিতে পারিলেই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ অনেক সহজ হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহাই প্রথমে জানা দরকার। দীর্ঘ দিন ধরিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এই ধারণাই বদ্ধমূল ছিল যে তাঁহারা শ্রমিক শ্রেণী হইতে উন্নততর জীব এই মিথ্যা আত্মাভিমানের জন্যই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে কর্ম্মচারী সম্প্রদায় শ্রমিকের সংগ্রামের পাশে আসিয়া তাহাকে শক্তিশালী করিয়া তুলে নাই। শুধু যে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে সাহায্য করে নাই তাহা নহে পরন্তু অধিকাংশ স্থলেই শ্রমিকের সংগ্রামের বিরুদ্ধতা করিয়া মালিক শ্রেণীকে সাহায্য ও শক্তিশালীই করিয়াছে। অথচ বোঝা দরকার মধ্যবিত্ত কর্ম্মচারীও শ্রমিক শ্রেণীর ন্যায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শোষিত হয়, শ্রমিকের ন্যায় তাহাকেও নিজের শ্রম বেচিয়া দিন গুজরাইতে হয়। প্রভেদ শুধু—শ্রমিক কায়িক পরিশ্রমে রুটীর জোগাড় করে আর মধ্যবিত্ত করে কলম পিষিয়া। পুঁজিবাদী শোষণে উভয়েই মৃতপ্রায়। সুতরাং সেই শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মুক্তির উদ্দেশ্যে যে কেহই আঘাত করুক না কেন, তাহা পরোক্ষভাবে সমগ্রভাবে মেহনতী জনতার মুক্তির সহায়ক। এই দিক দিয়া ডাক তার, রেল, ডক শ্রমিক ও কর্ম্মচারীর সংগ্রাম অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ও কর্ম্মচারীর সংগ্রামের পথ অনেকাংশে সহজ করিয়া দিবে; আর এই লড়াইতে সফল হইতে পারিলে যে প্রত্যেকের দাবী আদায়ের যথেষ্ট সুবিধা হইবে তাহাও নিশ্চিৎ। কিন্তু যদি এই বিরাট শ্রমিক বিক্ষোভ বিফল হইয়া যায় তাহা হইলে সাধ্য কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রমিক ইউনিয়নগুলির ক্রমবর্দ্ধমান নগ্ন ফ্যাসিবাদী আক্রমনের মুখে নিজেদের দাবী আদায় করিয়া লয়। ফলে সমগ্র ভারতবর্ষে হিটলারশাহী কায়েম হইতে বেশী দেরী হইবে না। অতএব প্রত্যেকটি শোষিত মধ্যবিত্তকে শ্রমিক শ্রেণীর পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে, প্রত্যেকটি শ্রমিক ও কর্ম্মচারীর ইউনিয়নকে আগামী ধর্ম্মঘটকে সফল করিয়া তুলিবার কঠিন কঠোর দায়িত্ব লইতে হইবে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে—বুঝিলাম ত দায়িত্ব লইতে হইবে; কিন্তু কেমন করিয়া? উত্তর অতি সরল। পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থায় অতিষ্ট হইয়া বহু আবেদন নিবেদন করিয়া যখন ভুখা শ্রমিক ও কর্ম্মচারী লড়াই এর পথে নামিয়া আসিতে বাধ্য হয় তখন তাহাকে সাহায্য করার একটিমাত্রই পথ আছে, সে পথ হইল নিজ নিজ ক্ষেত্রে পুঁজিবাদকে যথাশক্তি আঘাত হানা। অর্থাৎ প্রয়োজনমত সংগ্রামী ধর্ম্মঘটী শ্রমিক কর্ম্মচারীর সহানুভূতিতে সাধারণ ধর্ম্মঘট

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

কথা-প্রসঙ্গে

একটা কথা প্রায়ই শোনা যাচ্ছে—সরকার নাকি সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে যে দুর্নীতি প্রবেশ করেছে তাকে দূর করতে বদ্ধ পরিকর। এতদিন ভারত সরকারের এক কথা আর অন্য কাজের অসংখ্য উদাহরণ দেখে বোঝা গিয়েছে যে সরকারের নীতির বালাই নেই। যখন যেটা খুসী তা বললেই হল আর সুবিধামত যা বলা হল তার উল্টো কাজ করলেই হল। তাই এ হেন নীতিহীন প্রভুদের শ্রীমুখ থেকে যখন দুর্নীতি দূর করার কথা শোনা যায় তখন ভূতের মুখে রাম নামেরই কথা মনে পড়ে। তার ওপর এতদিন ত শুনে আসা হচ্ছিল—ভারত-সরকারের বড় বড় মাতব্বর ব্যক্তিরা অত্যন্ত সাধুচরিত্রের। তাঁদের মারাত্মক রকমের সাধুতার প্রমান জনসাধারণ টের পেয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে তাই দুর্নীতি দূর করার কথা বলার চালটা। জানা গিয়েছে এক বড় অফিসার বেশ কয়েক লাখ টাকার ঘরবাড়ী তৈরীর সরঞ্জামপত্র বিক্রি করে দিয়ে টাকাটা নিজের পকেটজাত করেছেন। ঠিক ছিল সরঞ্জামগুলি দিয়ে ভারত সরকার একটা কারখানা প্রতিষ্ঠা করবে। এতে আর এমন অন্যায় কি হয়েছে? গ্রাম বা টাউন কংগ্রেস কমিটির কর্ত্তা ব্যক্তিরা যদি "আমরাই সরকার" এই কথা বলে সমানে ডান হাত ও বাঁ হাতের কাজ চালিয়ে যেতে পারেন তাহলে খোদ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কাজ করে নিজেকে সরকার এবং সরকারী মালকে নিজের মনে করে বিক্রি করা এবং দামটা পকেট জাত করা কি এতই অন্যায়? অন্যায় ত নয়ই বরং যে কর্ম্মচারী সরকারের সঙ্গে নিজেকে এই রকম একাত্মকরণ করেছে তার চাকুরীতে উন্নতি হওয়া উচিত। আর এখন যে তা হচ্ছে তারও প্রমান পর্ব্বত সমান। সুতরাং জনসাধারণের বলার কিছু থাকতে পারে না। আর এক ভদ্রলোক কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে একসঙ্গে দুটো চাকুরী করে চলেছেন। আহা, মন্ত্রীদের মতই কর্ম্মক্ষম ব্যক্তি! যতই দিন যাচ্ছে মন্ত্রীরা ততই নতুন নতুন বা পুরান কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের শোভা বাড়াচ্ছেন; আর কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের সভায় যোগদানের জন্য ভাতাও তাঁরা পাচ্ছেন। মন্ত্রীরা যদি অন্য জায়গায় ভাতা পেয়েও সরকারী মাইনে পুরোপুরি পেতে পারেন তাহলে এক ভদ্রলোক এক সঙ্গে দুজায়গায় সরকারী মাইনে পেতে পারেন না কেন? দোষ কোথায়? আর যদি কাজের কথাই বলা হয় তাহলে বলতে হয় কাজ ত হচ্ছেই। স্বাধীনতা পাবার পর বড় বড় অফিসারদের সংখ্যা ১০ গুণের মত বাড়িয়েও এবং তাঁদের মাইনে ৫।৭ গুণ চড়িয়েও যখন হালে পানি পাওয়া যাচ্ছে না তখন দুটোই আরও কয়েক গুণ বাড়ালে ভাল হতে পারে।

* * *

মানুষের জ্ঞান যে অসীম তার জলজ্যান্ত প্রমান মিলেছে। ব্ল্যাক মার্কেট অর্থাৎ কাল বাজার যে সমগ্র জাতীর মুখ কাল করে দিচ্ছে এই রকম কথাই এত দিন জানা ছিল; আর আজ পর্য্যন্ত নিজেদের জীবন, যৌবন, ধন, মান দিয়ে এমন কি মরে মরেও আমরা অনুভব করছিলাম। কালবাজারের কল্যানে আর বেশী দিন এই মর জগতে বাসা বাঁধতে হবে না, স্বর্গ প্রাপ্তি হল হল বলে। কিন্তু এখন বুঝছি ধারণাটা নেহাৎ মায়া। কারণ ধার্ম্মিকপ্রবর স্বয়ং বড়লাট বাহাদুর চক্রবর্ত্তী রাজাগোপাল যখন বলেছেন—"We may fret now about the Black Market but who knows whether this evil will not serve some useful purpose and ultimately work out towards a good we know not of"—আমরা এখন কালবাজার নিয়ে আন্দোলন করতে পারি কিন্তু কে জানে এই অন্যায় কাজটি কোন প্রয়োজনীয় কাজ সাধন করবে না। এবং অবশেষে সুফল প্রসব করবে না। চোরাকারবারে যে অবশেষে ভাল ফল ফলবে এ কথা আমরা আর কেমন করে জানব? আমরা ত চোরাকারবারী নই। রাজাজীর জানা সম্ভব বড়লাট বাহাদুরের চোরাকারবারের এই আধ্যাত্মিক ভাষ্যের পর নিশ্চয় আর কেউ চোরাকারবার বন্ধের জন্য আন্দোলন করবে না। কলকাতা লাটভবনে থাকার সময় লাট বাহাদুরের যে কৃষ্ণ প্রেম উচ্ছসিত হয়ে পড়েছিল "কীর্ত্তন শ্রবণের" মধ্যে দিয়ে তা দেখছি উগ্র রূপ ধারণ করেছে—যেহেতু কিছু কৃষ্ণ বর্ণের তাই রাজাজীকে অনুরাগী করে তুলছে তার দিকে কালবাজারও তাই বাদ যায় নি। আহা এ যে প্রেমজর্জর শ্রীরাধাভাব। আমার ইতরজন অত উঁচুতে আমাদের নজর চলে না; তবুও গুরুবাদী দেশ ভারতবর্ষের ইজ্জত বাঁচাবার জন্যই বলতে হচ্ছে—হে লীলাময়, তোমার লীলা তুমি বোঝ; আমরা তোমার তল পা কেমন করে,! কংগ্রেস ছেড়ে লীগ মহলের সঙ্গে দহরম মহরম থেকে আর করে, ভারত ব্যবচ্ছেদের শ্যাম পর্য্যন্ত তোমারই সৃষ্টি, অজ্ঞ জনসাধারণের চোখে

(৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

শ্রমিক নিয়োগ ব্যবস্থা——ধনতন্ত্রে ও সমাজতন্ত্রে

আধুনিক সোবিয়েৎ যুগের মানুষদের বেকার সমস্যার সহিত বাস্তব ক্ষেত্রে কোন পরিচয় নাই। বেকার সমস্যার কথা তাহারা পুস্তকেই পড়িয়াছে। ১৯৩০ সালে সোবিয়েতে শেষ বেকারের নাম খাতায় লেখা হইয়াছিল। সেই বছরেই ধনতন্ত্রের রাজত্বে বেকারের সংখ্যা ছিল ২ কোটি। তাহাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া মোট ৬ কোটি হইতে ৮ কোটি লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার কোন উপায় ছিল না। ১৯৩০ সালে বেকারের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩ কোটি। ১৯৩৭ সালে বেকারের সংখ্যা দাঁড়াল ১ কোটি ৪০ লক্ষ এবং ১৯৩৯ সালে ১ কোটি ৮০ লক্ষ। ঐ সংখ্যা পরাধীন উপনিবেশ গুলিকে বাদ দিয়া ধরা হইয়াছে কারণ পরাধীন দেশের বেকার সংখ্যার কোন হিসাব ছিল না।

যুদ্ধের সময়ে লক্ষ লক্ষ লোক সৈন্যদলে ভর্ত্তি হয় এবং সামরিক শিল্পে বহু লোক চাকুরী পায় বলিয়া বেকার সমস্যা কিছুটা হাল্কা হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের অবসানে বেকার সমস্যা পুনরায় গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। আমেরিকায় ৬০ লক্ষ লোক পূর্ণ বেকার এবং ৮০ লক্ষের কোন পাকা কাজ নাই। মার্শাল পরিকল্পনার কল্যানে ফ্রান্সে বহু শিল্প বন্ধ হইয়া গিয়াছে। গত ৯ মাসে বেতার ও বিদ্যুৎ শিল্পের শতকরা ২০ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করা হইয়াছে। ব্রিটেনেও শিল্পক্ষেত্রে অবনতি ঘটিতেছে বিশেষ করিয়া জাহাজ শিল্পে। ইতালীতে ৩০ লক্ষাধিক পূর্ণবেকারকে বাদ দিয়া আরও ২০ লক্ষ দিন মজুর বছরে ৬ মাস কোন কাজ পায় না। অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশেরও একই অবস্থা।

ধনতান্ত্রিক দেশে ফোরম্যান, কণ্ট্রোলার, সুপারভাইসর ইত্যাদি কয়েকটি উচ্চ স্তরের কর্মচারী ভিন্ন প্রত্যেক স্তরের শ্রমিকদের বেকার-দশায় পড়িতে হয়। বেকারত্ব মানেই ক্ষুধা, অনাহার, শীত, চরম দুর্দ্দশা। বেকার হইব না, এমন কথা কেউ বলিতে পারে না। যুদ্ধের আগে আমেরিকায় প্রতি ৫ জনে ১ জন বেকার ছিল, জার্মাণীতে, ইংলণ্ডে এবং অষ্ট্রিয়ায় প্রতি ৩ জনে ১ জন বেকার ছিল।

ব্রিটিশ শ্রমদপ্তরের হিসাবে দেখা যায় যে ব্রিটেনে পুরুষের ক্ষেত্রে বাৎসরিক বেকারত্বের মেয়াদ ১৪১ দিন এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ৯৫ দিন। আর একটি ভয়াবহ ব্যাপার হইল চাকুরী পাইবার বয়সের নির্দ্দিষ্ট সীমা যাহাকে মার্কিন শ্রমিকেরা বলে "dead line" বর্ত্তমানে এই বয়স নামিতে নামিতে ৩৫।৪০ এর কোটায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক ইত্যাদি মস্তিষ্ক শ্রমিকেরাও বেকার সমস্যা হইতে রেহাই পায় না। ইহাদের মধ্যেও বেকারত্ব দিন দিন বাড়িতেছে।

বেকার সমস্যার বোঝা শুধু বেকারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীকে এই বোঝা বহিতে হয় কারণ ধনতান্ত্রিক পরিস্থিতিতে বেকার সমস্যা "মজুর বাজারে" প্রচণ্ড চাপ দেয় যাহার ফলে সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর দুর্দ্দশার অবধি থাকে না। লক্ষ লক্ষ বেকার থাকার ফলে চাহিদা ও সরবরাহের (demand and supply of labour) মধ্যে যে অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করে তাহার সুযোগ লইয়া মালিক

ই, ফ্রোলেফ্

মজুরী কমাইয়া মুনাফা বাড়ায়। ফলে উৎপাদনের অনিষ্ট ঘটে।

ধনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে মজুরীর কোন স্থায়ীত্ব নাই শিল্পাবর্ত্তে (Industrial Cycle) সংকট, মন্দা বা চড়া কোন্ অবস্থা চলিতেছে এবং বেকার সংখ্যা কত এই বিষয় গুলির উপর মজুরীর হার নির্ভর করে। বেকারদল ভারী হইলে ধনিকের আক্রমণ ও শোষণ তীব্র হইয়া উঠে।

ধনিক শ্রেণী আর এক দিক দিয়া মুনাফা বৃদ্ধির কায়দা করে। শ্রমিক শ্রেণী কতৃক উৎপন্ন পণ্য দ্রব্যে শ্রমিক শ্রেণীর অংশীদারী কমাইয়া মালিকেরা মুনাফা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে। একটি কায়দা হইল পণ্যের দর বাড়ান। যুদ্ধোত্তর ধনতান্ত্রিক পরিস্থিতিতে সমস্ত দেশের ধনিকেরা কৃত্রিম উপায়ে ফাঁপাই-মুদ্রা পরিস্থিতির সৃষ্টির দ্বারা পণ্যের বাজার দর বাড়াইয়া দেয় এবং লোকের জীবনযাত্রার অবনতির সুযোগ লইয়া প্রচুর মুনাফা শীকার করে। মিউনিসিপ্যাল সার্ভিসের মাশুল বৃদ্ধি করিয়া নানা প্রকার কর বাড়াইয়া ধনিক আর এক দিক হইতে পয়সা আনে।

গত দুই বৎসরের আমেরিকায় বাজার দর শতকরা ৭৫ ভাগ বাড়িয়াছে পাইকারী ক্ষেত্রে ; খুচরা ক্ষেত্রে আরও বাড়িয়াছে। যে ক্ষেত্রে যুদ্ধের সময়ে সর্ব্বোচ্চ মুনাফা হইয়াছিল ২৪০০ কোটী ডলার সে ক্ষেত্রে ১৯৪৭ সালে হয় ৩০০০ কোটী। ১৯৩৯ সালে ঐ সংখ্যা ছিল ৬৪০ কোটী। ১৯৪৭ সালে শতকরা ৬০টি মার্কিন পরিবার নিম্নতম বাঁচিবার মত মজুরীও পায় নাই। ১৯৪৭ সালে ব্রিটেনে বাজারদর যুদ্ধের আগেকার তুলনায় দ্বিগুণ হয়। তাহার পরে দাম আরও বাড়িয়াছে। তাহা ছাড়া নানাপ্রকার কর এবং রেলভাড়া বাড়িয়াছে। ব্রিটিশ সরকারী হিসাবেই প্রকাশ যে অধিকাংশ শিল্পেই নিম্নতম বাঁচিবার মত মজুরীর অর্দ্ধেকও দেওয়া হয় না। ফ্রান্সে ১৯৪৮ সালের অক্টোবরে শ্রমিক শ্রেণীর ক্রয়শক্তি যুদ্ধপূর্ব্বকালের তুলনায় প্রায় অর্দ্ধেক হইয়াছিল।

সোবিয়েৎ ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অন্যরকম। সেখানে বেকার সমস্যা, সংকট, ফাঁপাইমুদ্রা ইত্যাদির অস্তিত্ব নাই। থাকিতেও পারে না। যুদ্ধের পরেরও যুদ্ধের আগেকার মত নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রসারমান অর্থনীতির কল্যানে প্রত্যেকেই কাজ পাইতেছে। সোবিয়েৎ সরকারকে চাকুরী দেওয়া লইয়া মাথা ঘামাইতে হয় না। বরং লোকাভাব সমস্যা লইয়া মাথা ঘামাইতে হয়। সেজন্য এক পূর্ব্বপরিকল্পিত শ্রমিক শিক্ষা ব্যবস্থা করা হইয়াছে সব সময় শিক্ষিত শ্রমিক মজুত রাখার জন্য। যুবকদের সকল প্রকার কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যুদ্ধোত্তর ৫ সালা পরিকল্পনায় ৪৫ লক্ষ শিক্ষিত হইবার কথা।

প্রথম ৫ সালা পরিকল্পনার সময়ে শ্রমিক ও কর্ম্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ১১৩০০০০০ জন এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে ৪১০০০০০ জন। প্রথম পরিকল্পনার সময়ে গড় মজুরী বৃদ্ধির হার হইয়াছিল দ্বিগুণ এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময়ে ২·১ গুণ। যুদ্ধোত্তর কালের মাত্র একবছরেই শ্রমিক সংখ্যা বাড়িয়াছে ২৪০০০০০ এবং আসল বেতন বাড়িয়াছে দ্বিগুণের ও বেশী।

সোবিয়েৎ ইউনিয়নে নিয়মিত ভাবে পণ্যমূল্য কমান হইতেছে এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারে অধিকতর ব্যয় করা হইতেছে।

—টাস্

—০—

হাজরা পার্কে বিক্রয়কর প্রতিবাদ সভা

নূতন সংশোধিত বিক্রয় কর বিলের প্রতিবাদে পশ্চিম-বঙ্গ সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের উদ্যোগে গত ২৯শে জানুয়ারী বিকাল ৫ টায় হাজরা পার্কে এক বিরাট জনসমাবেশ হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রমিক নেতা কমরেড তাপস সেন। বক্তৃতা করেন সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ, বিখ্যাত শ্রমিক নেতা নীহার মুখার্জী, মনি মুখার্জী এবং সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার ছাত্র ব্যুরোর সম্পাদক সুকোমল দাসগুপ্ত। নূতন বিক্রয় কর বিল যে জনসাধারণের জীবনযাত্রাকে বিশেষভাবে দুরবস্থার মধ্যে টানিয়া নামাইবে তাহা উপস্থিত বক্তাগণ বিশদভাবে ব্যাখা করেন। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্ব সম্মতি ক্রমে গৃহিত হয়:—

পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্তৃক গৃহিত নূতন সংশোধিত বিক্রয় কর বিল জনসাধারনকে তীব্রভাবে শোষন করিবার অস্ত্র হিসাবে গ্রহন করা হইয়াছে বলিয়া কলিকাতার জনসাধারনের এই সভা মনে করে এবং মালিকের মুনাফাকে অব্যাহত রাখিয়া করভাবে প্রপীড়িত জনতার বুকের উপর নূতন এই কর চাপাইবার জন্য সরকারী চক্রান্ত কে তীব্র নিন্দা করে। এই সভা আরও ঘোষনা করিতেছে যে পশ্চিমবঙ্গ সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের প্রচেষ্টায় বিক্রয় করের প্রতিরোধের জন্য মিলিত শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেনী লইয়া মহল্লায় মহল্লায় যে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে তাহাকে জোরদার করিয়া তুলিবার দায়িত্ব লইতেছে।

পুলিশের জুলুমবাজী

আগড়পাড়া জুটমিলে শ্রমিক ছাঁটাই লইয়া শ্রমিকদের মধ্যে যে অশান্তি দেখা দিয়াছে তাহা যাহাতে ধর্ম্মঘটে রূপ লইতে না পারে তাহার জন্য স্থানীয় পুলিশ কর্ম্মতৎপর হইয়াছে। ইউনিয়নের জঙ্গী-কর্মীদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য তাহারা সজাগ পাহারা দিতেছে। আগড়পাড়া জুট মিলস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সম্পাদক ও এস, ইউ, সির বিখ্যাত কর্মী কমরেড দুর্গা মুখার্জী প্রমুখ নেতাদের গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। সংবাদে প্রকাশ ইউনিয়ন অফিসের সাইনবোর্ডটী পুলিশ রাতের অন্ধকারে সরাইয়া লইয়া যায়। পুলিশের এই ধরণের কাজে শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ বাড়িয়া উঠিতেছে।

সংগ্রাম ব্যতীত বাঁচার উপায় নাই

(২য় পৃষ্ঠার পর)

পরিচালনা করা। সে প্রয়োজন পড়িবে। যে সংগ্রাম আসিতেছে তাহা ভারতীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে; সুতরাং সংগ্রাম যে তীব্র এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সরকারপক্ষ এবং ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী ভালভাবেই জানে এ লড়াইয়ে তাহাদের পরাজয় ঘটিলে শ্রমিক শ্রেণীর শক্তি বহুগুণ বাড়িয়া যাইবে অথচ ভারতের ফ্যাসিবাদী কংগ্রেসী সরকার তাহা সর্ব্বপ্রকারে বাধা দিতে বদ্ধপরিকর। শ্রমিকও সংগ্রামে নামিয়া যথাশক্তি লড়াই না করিয়া আত্মসমর্পন করিয়া নিজের নিশ্চিৎ ধ্বংস ডাকিয়া আনিতে পারে না। সুতরাং আগামী ধর্ম্মঘট দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে, অত্যাচার, জুলুম ও নিষ্পেষণ উগ্রভাবে চলিবে এই কথা জানিয়াই সংগ্রামে নামিতে যাইতেছেন ডাক তার, রেল ও ডক শ্রমিক ও কর্ম্মচারী। এই দিক দিয়া বিচার করিয়া নিশ্চিন্তে বলা যায় সারা ভারতব্যাপী সমস্ত কারখানা, সওদাগরী ও সরকারী অফিসের শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের ইহার সমর্থন ও সহানুভূতিতে ধর্ম্মঘট করিতে হইবে। তাহার জন্য সাংগঠনিক প্রস্তুতি চূড়ান্তভাবে করিয়া যাইতে হইবে। অন্যান্য শ্রমিক কর্ম্মচারী ইউনিয়নগুলির ইহাই হইল বর্ত্তমানের কাজ।

ইতিমধ্যে ডাক তার, রেল, ডক প্রভৃতি বিভাগের সংগ্রামী শ্রমিক কর্ম্মচারীদের দৃঢ়তা এবং তাহাদের পিছনে জনসমর্থন ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে দেখিয়া ইংরাজী ব্যবসায়ী মহলের মুখপত্র ষ্টেটস্‌ম্যান হইতে আরম্ভ করিয়া ভারত সরকার, এমন কি পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জী পর্য্যন্ত সকলেই ধর্ম্মঘটের বিরুদ্ধে প্রচারে লাগিয়া গিয়াছেন। নেতাদের বন্ধু ইংরাজ ব্যবসাদার মহলের মুখপত্র ভারতবন্ধু ত এক বিরাট সম্পাদকীয় লিখিয়া ফেলিয়াছেন ধর্ম্মঘট হইলে ভারতবাসীর কতই না দুঃখ হইবে তাহার জন্য বিলাপ করিয়া—"তাহা সত্বেও তাহারা যদি জনসাধারণের বহু দুঃখের বোঝার উপর তাহাদের ধর্ম্মঘটকে চাপাইয়া দেয় তাহা হইলে যে সহানুভূতি তাহারা অর্জ্জন করিয়াছে তাহা হারাইবে" (১৯-১-৪৯)। ঐ একই তারিখে পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস সভাপতি মহাশয়ও বিবৃতি দিলেন—'বর্ত্তমানে ধর্ম্মঘট করিলে উহা দেশ ও রেল কর্ম্মচারীদের নিজেদের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে..... রেল কর্ম্মীরা বহু দিন অপেক্ষা করিয়াছেন। আমি তাঁহাদিগকে আরও কিছু দিন অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিতেছি" (পশ্চিম বঙ্গ পত্রিকা)। ভারত সরকার ঢাক ঢোল বাজাইয়া প্রচারে লাগিলেন রেল, ডাক তার, ও অন্যান্য সরকারী শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের দাবী দাওয়া মিটাইয়া একটি সরকারী পরিকল্পনা ঘোষিত হইতেছে।

ভারত-বন্ধুর কথায় বোঝা যায় ধর্ম্মঘট হইলে জনসাধারণের বহু দুঃখের বোঝা আরও বাড়িয়া যাইবে। জনতার এই বহু দুঃখের বোঝার জন্য দায়ী কে? সরকার ও মালিক শ্রেণী না শ্রমিক ও মেহনতী জনসাধারণ? পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি কলিকাতার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের জীবনযাত্রার ব্যয় সম্পর্কে যে সংখ্যা-বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় ১৯৩৯ সালের আগষ্টে সূচক সংখ্যা ১০০ ধরিলে গত ডিসেম্বর মাসে বস্ত্র-মূল্যের সূচক হয় ৫৮৯·৩, খাদ্যের ৩৮৪·৯, আলানী দ্রব্যের ৪৯১·৪। সরকারী নীতির কল্যাণে এক বৎসরের মধ্যে বস্ত্র মূল্য শতকরা ৩০০ ভাগ, খাদ্যদ্রব্য ৩৮·৮ ভাগ বাড়িয়াছে। সরকার কি আজ পর্য্যন্ত কোন চেষ্টা করিয়াছে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম কমাইতে? দিনের পর দিন শ্রমিক আমরণ খাটিয়া উৎপাদন বাড়াইয়া চলিতেছে, মালিকের লাভ বাড়িতেছে কিন্তু দরিদ্র শ্রমিক, কেরাণীর আপেক্ষিক আয় বাড়িতেছে না। তবুও শ্রমিক ও কেরাণীরাই দোষী। অপেক্ষা শ্রমিক ও কর্ম্মচারীরা অনেক দিনই করিয়াছে। দীর্ঘ আড়াই বৎসরের মধ্যে সরকারের সময়ই হইয়া উঠিল না শ্রমিক কর্ম্মচারীর কথা চিন্তা করিতে। সুতরাং আর অপেক্ষা করা চলে না অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য। আর ভারত সরকারের পরিকল্পনাতে শ্রমিক কর্ম্মচারীর কোন দাবীই স্বীকৃত হয় নাই। রেল শ্রমিক দাবী করিয়াছিলেন নগদ ৩৫৲ টাকা মাগগীভাতা ও পূর্ব্বের মত সুবিধাদরে রেশনের ব্যবস্থা, বেতন সম্পর্কিত সকল অন্যায় অবিচার দূর করা, প্রায় ২ লক্ষ অস্থায়ী শ্রমিককে স্থায়ী করা এবং আরও অনেক দাবী। ডাক তার শ্রমিক কর্ম্মচারীর দাবী ছিল পে কমিশনের নির্দ্ধারিত হারে মাগগী ভাতা দিতে হইবে, বেতনের হার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, এবং সমস্ত অস্থায়ী শ্রমিক কর্ম্মচারীকে স্থায়ী করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য বিভাগও অনুরূপ দাবী করিয়াছিলেন। ইহার বিনিময়ে তাঁহাদের কপালে জুটিয়াছে কেবলমাত্র ১০৲ টাকা মাগগী-ভাতা বৃদ্ধি; তাহাও আবার সকলের জন্য নহে। যাঁহারা ২৫০৲ টাকা বা তদূর্দ্ধ বেতন পান তাঁহারা এবং আরও অনেকে ইহা হইতে বঞ্চিত হইবেন। এক ডাক ও তার বিভাগের ৪৫ হাজার একসট্রা ডিপার্টমেণ্টাল এজেণ্ট ও অস্থায়ী শ্রমিকরা এই বৃদ্ধির আওতায় আসিবেন না। শুধু এইভাবে মাগগী-ভাতা সম্বন্ধেই পে কমিশনের রায়কে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে তাহা নয়, বেতন ও স্থায়ী-করণের বেলায়ও তাহাই। এক রেল ও ডাক বিভাগেই অস্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা আড়াই লক্ষের মত অথচ ইঁহাদের চাকুরীর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সরকার কোন উচ্চবাচ্য করে নাই। এক দিকে শ্রমিক কর্ম্মচারীর এই ন্যায় সঙ্গত দাবী অস্বীকার করা হইতেছে অন্য দিকে জনসাধারণকে মিথ্যা বোঝান হইতেছে শ্রমিক কর্ম্মচারীদের প্রায় সকল দাবীই স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য ধর্ম্মঘটের পিছন হইতে জনসমর্থনকে সরাইয়া আনা।

এই ধাপ্পাবাজীর উপযুক্ত জবাব একমাত্র সংগ্রামের মুখেই দেওয়া সম্ভব। এই সংগ্রামে সঠিক মনোবল রক্ষা করিতে হইলে পরিষ্কারভাবে ধারণা থাকা দরকার কেন লড়িতেছি, কাহার বিরুদ্ধে, এবং কতদিন এই লড়াই চলিবে। এই কথাগুলি ভালভাবে বুঝিতে পারিলেই তবে সংগ্রাম করার অর্থ হইবে নচেৎ সংগ্রামে জয়ী হইয়া কিছু রোজগার বৃদ্ধি করিতে পারিয়াই নিশ্চিন্ত হইলে কোন লাভ নাই। এক কথায় ধর্ম্মঘট হইতে রাজনৈতিক শিক্ষা লইতে হইবে, শ্রেণীসচেতনতা বৃদ্ধি করিতে হইবে নচেৎ শুধু অর্থনৈতিক দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলে যে তিমির, যে দুঃখ, যে অভাব-অনটন তাহা চির-সাথী হইয়া থাকিবে, সুখী শোষণহীন সমাজব্যবস্থা আর কোন দিনও গড়িয়া উঠিবে না, মানুষের মত বাঁচিবারও সুযোগ মিলিবে না। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় মজুরী বাড়িলেও শ্রমিকের দুঃখ ঘোচে না; তাহার কারণ মজুরী বাড়াইবার সাথে সাথে জিনিষপত্রের দামও বাড়িতে থাকে ফলে আপেক্ষিক ভাবে তাহার ক্রয়-শক্তির কোন উন্নতি হয় না। একথার প্রমান মিলিবে যুদ্ধের পূর্ব্বের মজুরীর সহিত বর্ত্তমানের বর্দ্ধিত মজুরীর তুলনা করিলে। মাহিনা ও মজুরী বাড়িয়াছে কিন্তু তাহাতে দুঃখ ও দারিদ্র্য বাড়িয়াছে বই কমে নাই। নিজেদের স্বার্থের জন্যই এই সর্বনাশাকর অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করিতে হইবে, নিজেদের জন্য উন্নততর ও মানুষের মত বাঁচিবার অবস্থা সৃষ্টি করিতে হইবে। অথচ শোষণ যতদিন থাকিবে ততদিন এই উন্নততর সমাজ-ব্যবস্থা জন্ম লইতে পারে না। পুঁজির একমাত্র লক্ষ্য হইল শ্রমিকদের শোষণ এবং পুঁজিপতির মুনাফার একমাত্র পথ শ্রমিককে শ্রম অনুযায়ী মজুরী না দিয়া কোন রকমে বাঁচিবার মত মজুরী দিয়া বাকি নিজের পকেটজাত করা। সুতরাং যতদিন পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা থাকিবে ততদিন শ্রমিকের ন্যায়সঙ্গত অধিকার, মানুষের মত সুখে সচ্ছন্দে বাঁচিবার অধিকার স্বীকৃত হইবে না।

এই পুঁজিবাদী শোষণকে দূর করিতে হইলে শুধু অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে চালিত সংগ্রামে কিছু হইবে না। গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে পালটাইতে পারিলেই তবে তাহা হইতে মুক্তি মিলিবে। কিন্তু যখনই শ্রমিক শ্রেণী ধীরে ধীরে বিপ্লবী আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে তখনই মালিক শ্রেণীর পুঁজিবাদী রাষ্ট্র তাহার হাতিয়ার—পুলিশ, আইন, আদালত, সৈন্য এমন কি ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠান পর্য্যন্ত লইয়া আগাইয়া আসে শ্রমিকের বিরুদ্ধে। এই কারণেই শ্রমিক যখন সংগ্রামে নামে মালিকের সহিত শক্তি পরীক্ষায় তখন প্রত্যক্ষ ভাবে সেই সংগ্রাম সরকারের বিরুদ্ধে না হইলেও আপাতদৃষ্টিতে পুঁজিবাদী সরকারের তাহার সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও সরকারী পুলিশ বাহিনী আসিয়া সংগ্রামী শ্রমিককে গ্রেপ্তার করে, দেশের প্রচলিত আইনে শ্রমিক শাস্তি পায়, সৈন্যবাহিনী তাহার উপর গুলি চালায় এবং শ্রমিক যাহাতে ভবিষ্যতে সংগ্রাম না করে তাহার জন্য নেতারা এবং ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তারা ধনীর টাকাকড়ির দিকে লোভ করিতে বারণ করে, নিরীহ ও শান্ত থাকার জন্য উপদেশ দেয়, শান্ত থাকার পুরস্কার হিসাবে পরলোকে স্বর্গ ও শান্তির আশা তুলিয়া ধরে এবং শ্রমিককে সংগ্রাম বিমুখ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে। শ্রমিক মজুরী বৃদ্ধির জন্য ধর্ম্মঘট করায় তাহার উপর গুলি বর্ষিত হয় কিন্তু মালিক লাভের পরিমান দিনের পর দিন লুঠিয়া পর্ব্বত প্রমান করিলেও পুঁজিবাদী রাষ্ট্র তাহার লুণ্ঠন বন্ধ করিবার জন্য কোন কার্য্যকরী উপায় গ্রহণ করে না। বড় জোর কিছু ধর্ম্মের অনুশাসন শুনাইয়া দেওয়া হয়।

সুতরাং বুঝিতে হইবে শুধু দুই পাঁচ টাকা মাহিনা বা মজুরী বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই ধর্ম্মঘট নয় বা তাহাতে সফল হইলেই কর্ত্তব্য শেষ হইল না। শ্রমিককে লড়িতে হইবে শোষিত শ্রেণী উপশ্রেণীর রাষ্ট্র গড়িবার জন্য। শোষণ সেখানে থাকিবে না, দুঃখ, দৈন্য, দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষ, বেকার সমস্যা সেখানে থাকিবে না; শিক্ষার ব্যবস্থা, রোগে ঔষধ, মানুষের মত আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ দিবে সেখানে রাষ্ট্র। ইহার জন্যই লড়িতে হইতেছে পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে, তাহার শ্রেণী-স্বার্থের রক্ষক

(৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

বি-পি-টি-ইউ-সির উদ্যোগে 'কালা-কানুন' প্রতিবাদ সভা

বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের কেন্দ্রীয় কমিটীর সভ্য কমরেড নীহার মুখার্জ্জির বক্তৃতা

ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী ফ্রণ্ট নেহেরু সরকারের ফ্যাসিবাদী আক্রমনের উপযুক্ত জবাব দিতে পারে

গত ২৯শে জানুয়ারী বি-পি-টি-ইউ-সির উদ্যোগে মনুমেণ্টের নীচে কালা-কানুনের প্রতিবাদে শ্রমিক কৃষক ও সাধারণ নাগরিকের এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিড়ি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কমরেড রহিম।

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য ও বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা কমরেড নীহার মুখার্জ্জি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে ১৪৪ধারা অবসানের পর বি, পি, টি, ইউ, সির এই প্রথম জনসভার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। জনসাধারণের মৌলিক অধিকারকে বাহত করিয়া বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের গলা টিপিয়া মারিবার জন্য যে ১৪৪ ধারা কলিকাতার বুকের উপর দীর্ঘ আড়াই মাস যাবত চাপিয়া বসিয়াছিল গত ১৮ই, ১৯শে ও ২০শে তারিখের আন্দোলনের চাপে সরকার তাহা প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই হিসাবে নাগরিক জীবনের ন্যূনতম দাবী আদায় ও রক্ষা করিবার জন্য শহীদদের আত্মাহুতি ব্যর্থ হয় নাই বলিতে হইবে। নেহেরু সরকারের ফ্যাসিষ্ট নীতিকে জনসমক্ষে আরও পরিষ্কারভাবে প্রকটিত করিয়া মোহবদ্ধ জনতাকে তাহারা আগামী বিপ্লবের প্রস্তুতির আহ্বান জানাইয়া গেল।

নেহেরু সরকার রাতারাতি ফ্যাসিষ্ট হইয়া উঠে নাই। ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়ই আমরা জনসাধারণকে সাবধান করিয়া বলিয়াছিলাম বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ দেশীয় ধনতন্ত্রের প্রতিভূ নেহেরু সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করিল তৎকালীন গণআন্দোলনগুলিকে পিছন হইতে আঘাত হানিয়া স্তব্ধ করিতে এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যবাদীর তাঁবেদার রূপে সম্পূর্ণভাবে পাইবার আশায়। কিন্তু আমাদের দেশের কোন কোন বামপন্থী দলের তখন নেহেরু সরকারের প্রতি মোহ ছিল চূড়ান্তরূপে। বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার কথা বলিয়া তাহারা অন্যান্য বামপন্থী দলগুলির বিরোধিতা পর্য্যন্ত করিয়া নেহেরু সরকারের প্রতি উগ্র সমর্থন জানাইয়াছিল। এই ভুল নীতির জন্য বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলন ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে সন্দেহ নাই।

আজ প্রতিটি বিষয়ে নেহেরু সরকার বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের আওতায় বর্দ্ধিত দেশীয় ধনিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী হিসাবেই কাজ করিয়া চলিয়াছে। ইহার প্রমান মিলিবে দেশের সমস্ত ধর্ম্মঘটগুলি ভাঙ্গিবার কাজে সরকারী ষড়যন্ত্রের মধ্যে, ভারতবর্ষকে বৃটিশ কমনওয়েলথের পিছনে বাঁধিয়া রাখিবার মধ্যে, সরকারের শ্রম ও শিল্পনীতির মধ্যে, জনসাধারণের মৌলিক সর্ব্বনিম্ন গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের মধ্যে। সরকারের এই নীতিতে জনসাধারণের দ্রুত মোহমুক্তি ঘটিতেছে সন্দেহ নাই, তাই দিনের পর দিন বিক্ষোভকে যতই সরকার চণ্ডনীতির জোরে, লাঠি, গুলি, গ্যাসের জোরে রুখিবার চেষ্টা করিতেছে ততই তাহা উগ্ররূপ ধারণ করিতেছে। আজ জনতা নেহেরু সরকারের নিকট ভয়ের জিনিষ। আর এই কারণেই জনতার কোন আন্দোলনকেই তাহারা রূপ লইতে দিতে রাজি নয়। তাই নয়াদিল্লীকে ইন্দোনেশিয়ার জন্য চোখের জলে ভাসাইয়া দিলেও ডাচ সাম্রাজ্যবাদের অন্যায় আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষন করা হয়। ফ্যাসিবাদী নেহেরু সরকার আজ গণশক্তির প্রসারে সন্ত্রস্ত। এশিয়া সম্মেলন এশিয়ার গণঅভ্যুত্থানকে নিশ্চিহ্ন করিবার ষড়যন্ত্র ও শলাপরামর্শ।

কমরেড মুখার্জ্জি সমস্ত বামপন্থী দলগুলিকে সাধারণ এবং নির্দিষ্ট সংগ্রামী কর্ম্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হইবার প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করিয়া বলেন, যে দ্রুত গতিতে ও উগ্রভাবে ফ্যাসিষ্ট নিষ্পেষণ চলিতেছে তাহাকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে না রোধ করিলে সরকার বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রত্যেকটি বামপন্থী দলকে একের পর এক নিশ্চিহ্ন করিবে। ফ্যাসিবাদী সাম্রাজ্যবাদী ইঙ্গ-মার্কিন শিবিরের এশিয়ার প্রহরী নেহেরু সরকারের প্রতি কোনরূপ মোহ থাকা শুধু ক্ষতিকারক নহে পরন্তু তাহা ধ্বংস ডাকিয়া আনিবে। সুতরাং প্রতিটি প্রকৃত বামপন্থীদলের কর্ত্তব্য হইতেছে কারখানায় কারখানায়, শ্রমিক বস্তিতে, শিল্পাঞ্চলে, গ্রামাঞ্চলে, জনসাধারণের প্রত্যেকটি সম্মেলন বা সমাবেশে নেহেরু সরকারের আসলরূপ প্রকাশিত করা, জনসাধারণের অর্থনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়া তাহাদিগকে পুঁজিবাদ বিরোধী শ্রেণীসচেতন করিয়া গড়িয়া তোলা; এক কথায় ভবিষ্যত বিপ্লবের সাংগঠনিক প্রস্তুতি করিয়া যাওয়া।

সভায় মকবুল আমেদ, বিজয় ব্যানার্জ্জি এবং রামচরিত রাম প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। কলিকাতার সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনে নিহত ছাত্রদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইয়া, মৃণালকান্তি প্রমুখ নেতাদের ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেস হইতে বহিষ্কার করার নীতিকে গ্রহন করিয়া এবং রেল শ্রমিক কর্ম্মচারী ধর্ম্মঘটের সমর্থন জানাইয়া সভায় একটি প্রস্তাব গৃহিত হয়।

—•—

কথা-প্রসঙ্গে

(২য় পৃষ্ঠার পর)

নিজের প্রদেশের প্রধান মন্ত্রীত্ব হারাবার সম্ভাবনা দেখে গান্ধীজীর নাম নিয়ে ভেসে পড়েছিলে তুমি খিড়কীর পথে, বড়লাটের এক লক্ষের গদি যখন লক্ষ্যবিদ্ধ হয়েছে তখন আধ্যাত্মিক বুলি ও তোমার মুখে সাজে সব চেয়ে বেশী। লীলাময় আর কত লীলা তোমার আছে?

* * *

নেতাদের মুখ থেকে আজকাল মাঝে মাঝে সত্যি কথা বেরিয়ে পড়ে দেখা যাচ্ছে। পণ্ডিতজী তার প্রমান দিয়েছেন। লক্ষ্ণৌ সাংস্কৃতিক সম্মেলনে পণ্ডিতজী যে বাণী পাঠিয়েছেন তাতে তিনি লিখেছেন—"আমাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকেরই উঁচু আদর্শ ও সুন্দর সুন্দর বুলি আউড়ে নিষ্কৃতি পাবার ঝোঁক দেখা যায়।" এ কথা হাজারবার সত্যি। প্রমান হাতে হাতে। "Our aim is not to build up a Police state but to raise the standard of living of masses"—আমাদের লক্ষ্য পুলিশী রাষ্ট্র গঠন নয়, পরন্তু জণসাধারণের জীবনধারনের মান উন্নত করা। কার কথা? পণ্ডিতজীর। দেশের ওপর পুলিশী দাপটে, গুলি, গোলা, লাঠি, গ্যাস, বেআইন, অর্ডিন্যান্স বর্ষণে সাধারণে অস্থির। আর জীবনধারণের মান ত মান রেখে রাখা যায় না; কতটা যে মানটা উঠেছে তা চর্ম্মচক্ষুতে ধরা পড়েনি বরং সরকারী হিসেবমতেও বলা হয়েছে ওটা বেশ নেমেছে। তবে প্রধান মন্ত্রী যদি বলেন যে নামাটা ওঠারই একটা বিশেষ ভঙ্গী। দার্শনিকের মত করে তাহলে বলার কিছু নেই। তারপর আরও প্রমান আছে। "Between British imperialism and Indian freedom there is no meeting ground"—বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ আর ভারতীয় স্বাধীনতার মধ্যে কোন মিলনভূমি নেই—এও পণ্ডিতজীর বাণী। আজ কিন্তু ভারতীয় স্বাধীনতা শুধু বৃটীশ কেন, ইঙ্গমার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গলায় মালা দিয়ে মিলন পাকা করে গৃহস্থালী করছে নিশ্চিন্তে। আরও প্রমান চাই? "I see no way of ending the poverty, the vast unemployment, the degradation and the subjection of the Indian people except through socialism. That involvs the ending of vested interests in land and industry as well as feudal and autocratic Indian states system That means the ending of private property"—সমাজতন্ত্র ব্যতীত ভারতীয় জনসাধারণের দারিদ্র্য, বেকারত্ব হীনতা ও অধীনতা দূর হবার অন্য কোন উপায় নেই, এর জন্য জমি ও শিল্পে কায়েমী স্বত্বের বিলুপ্তি এবং দেশীয় রাজ্যের স্বৈরতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের ধ্বংস—ঘটাতে হবে; ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ চাই। আজও এর একটাও হয় নি। হবার কোন লক্ষণও নেই, হবেও না পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে। সুতরাং বড় বড় বুকনি দিয়ে কাজ হাসিল করার চেষ্টা যে হয় তার সবচেয়ে বড় প্রমানই হলেনবক্তা স্বয়ং।

সংগ্রাম ব্যতীত বাঁচার উপায় নাই

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। নেতারা মুখে যত বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিন না কেন, যতই মহাত্মাজীর সাফাই গান না কেন তাঁহাদের এবং পুঁজিবাদী ভারতীয় রাষ্ট্রের লক্ষ্য পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ কায়েম করা। অসংখ্য শ্রমিক বিরুদ্ধ আইন, ধর্ম্মঘট করিবার অধিকার কাড়িয়া লওয়া, নির্বিবাদে শ্রমিক কৃষকের উপর গুলি বর্ষণ, বহু শ্রমিক ও কৃষক কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধিতে আপত্তি অথচ পুঁজিপতিদের মুনাফা ঠিক রাখা তাহাদের উপর কর কমাইয়া দেওয়া লাভের পরিমান বাড়াইবার সুযোগ দেওয়া, চোরাকারবার চালাইলেও শাস্তি না দেওয়া তাহার প্রমান। শ্রমিকের এই সংগ্রাম ততদিন চালাইতে হইবে যতদিন না তাহাদের রাষ্ট্র,—জনরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে চূর্ণ করিয়া, জনরাষ্ট্র গড়িতে হইলে চূড়ান্ত সংগ্রামের প্রয়োজন। তাহার প্রস্তুতির এই ধর্ম্মঘটগুলির লক্ষ্য—এই কথা মনে করিয়া সংগ্রামে নামিতে হইবে।

বি, এস, ম্যান ও সুইচম্যানের প্রতি কংগ্রেসী সরকারের দরদের প্রমাণ

- দক্ষ শ্রমিক অদক্ষ ও অর্দ্ধদক্ষ হিসাবে বিবেচিত
- রেল আইন ভঙ্গ করিয়া নেতাদের খেয়াল খুসীর প্রতিষ্ঠা
- পে কমিশনের রায় অগ্রাহ্য
- বি, এস, ম্যান ও সুইচ ম্যানদের প্রতি জুলুম

(গণদাবীর রেল রিপোর্টার)

আজ যে কি অবস্থায় রেল শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিতে যাইতেছেন তাহা সরকার জনসাধারণের নিকট সযত্নে চাপিয়া যাইতেছে। উপরন্তু তাঁহাদিগকে জানান হইতেছে রেল শ্রমিকের প্রায় সমস্ত ন্যায্য দাবীদাওয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে; শুধু জাতীয় সরকারকে বিপন্ন এবং দুর্গত জনসাধারণকে আরও দুর্গত করিবার জন্যই রেল শ্রমিকরা ইচ্ছা করিয়া ধর্ম্মঘট ডাকিয়া আনিতেছেন। কংগ্রেসী নেতাদের এই কথা যে কতদূর অসত্য তাহার প্রমান অনেক মিলিয়াছে; জনসাধারণ নেতাদের ধাপ্পাবাজীর ভাল পরিচয় জানেন তবুও প্রকৃত অবস্থা তাঁহারা অনেক জানেন না। বি, এস্ ম্যান ও সুইচম্যানদের প্রতি রেল কর্ত্তৃপক্ষের ও সরকারী অবিচার ও ঔদাসিন্যের পরিচয়ই নেতাদের মিথ্যাচারিতার প্রকৃষ্ট প্রমান দিবে।

বি-এস-ম্যান ও সুইচ ম্যানদের উপরই ট্রেন চলাচলের সম্পূর্ণ নিরপত্তা নির্ভর করে। কারণ তাঁহাদের যে সমস্ত কাজ করিতে হয় তাহার মধ্যে স্বাধীনভাবে ট্রেন পাসিং হইতে আরম্ভ করিয়া এ, এস; এমদিগকে যে সমস্ত কাজ করিতে হয় তাহার সমস্তই আছে উপরন্তু তাঁহাদিগকে অনেক কিছু বেশীও করিতে হয়। ট্রেন সিগন্যাল রেজিষ্টার বুক লেখা, ইলেকট্রিক ব্লক সিগন্যাল যন্ত্র ব্যবহার করা, তাহার সিগন্যাল টানা ও ফেলা, ট্রেন ড্রাইভারকে FNO OPT 27, OPT—80, SI-4 SI-23 ইত্যাদি কাগজপত্র দেওয়া ও নেওয়া প্রভৃতি যে সমস্ত কাজ এ, এস, এমকে করিতে হয় তাহা তাঁহাদিগকেও করিতে হয়; এ, এস, এমদের রেজিষ্টারের ১১ নং ঘরে যেমন নাম সহি করিতে হয় তাহা ইঁহাদিগকেও করিতে হয়। বরং কেবিন এ, এস, এমরা ট্রেনের লাইন ক্লিয়ার দেওয়া ও নেওয়া যাহা আরও তিনজনের সহায়তায় করিয়া থাকেন তাহা বি, এস ম্যান ও সুইচ ম্যানদের একাকীই এবং পূর্ণ দায়িত্ব লইয়াই করিতে হয়। সুতরাং ইঁহাদের কাজের উপর সহস্র সহস্র যাত্রীর নিরাপত্তা নির্ভর করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই দায়িত্ব ও কাজের গুরুত্বের জন্যই General rules of Indian States Railways এর ১।৩৭,৪৪ ও ১৮৮ নং আইনে লিখিত আছে—যাঁহারা স্বাধীনভাবে (independently) কেবিনে কাজ করেন তাঁহারা ষ্টেশন মাষ্টার হিসাবে অভিহিত হইবেন এই দিক দিয়া বিচার করিলে বি, এস, ম্যান ও সুইচম্যানরা এ, এস, এম পর্য্যায় ভুক্ত এবং দক্ষ শ্রমিক তাহাও অবশ্য স্বীকার্য্য।

ভারতীয় রেলের এই আইন অনুসারে এবং পে কমিশনের বিচারেও বি, এস ম্যান ও সুইচ-ম্যানরা দক্ষ শ্রমিক বলিয়া পরিগণিত হইতে বাধ্য এবং তাঁহাদের মূল বেতন ৬৪৲-৪-১৫০৲-৫-১৭০৲ টাকা হইতে বাধ্য। কারণ পে কমিশনের রায়ের প্রথম অনুচ্ছেদে আছে কেবিন-ইন-চার্জরা উপরোক্ত মাহিনার হার পাইবেন এব তাঁহাদিগকেই কেবিন ইন-চার্জ বলা হইবে যাঁহারা টেলিগ্রাফ এবং স্বাধীনভাবে ট্রেন পাসিং করেন। সেই হিসাবে এ, এস, এম (কেবিনরা) দক্ষ শ্রমিক এবং ঐ হারে বেতন পাইতেছেন। কিন্তু পে কমিশনের রায়ের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আছে যাহারা কেবল মাত্র স্বাধীনভাব ট্রেন পাসিং করেন যেমন বি, এস ম্যান ও সুইচম্যান তাঁহারাও কেবিন-ইন-চার্জ ও দক্ষ শ্রমিক বলিয়া বিবেচিত হইবেন। সুতরাং তাঁহারাও পে কমিশনের মতে ৬৪৲ হইতে ১৭০৲ টাকা বেতনের অধিকারী।

পে কমিশনের পূর্ব্বে বি, এস ম্যানরা (তৎকালীন বি, এ, রেল) ২৮৲-১-৩৬-২-৫৪৲ টাকা এবং সুইচ-ম্যানরা ২৫৲-১-৩০৲-২-৪০৲ টাকা পাইতেন এবং উভয় শ্রেণীর শ্রমিকরাই দক্ষ বলিয়া গণ্য হইতেন। এ কথা সরকারীভাবে D G M (P) MSAE ২৭৫ dated ২৯-১১-১৯৪০ নং চিঠিতে স্বীকৃত। সুতরাং কোন রকমেই বি, এস, ম্যান ও সুইচ ম্যানদের দক্ষ বলিয়া স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

তথাপি স্বাধীন ভারতে অন্যান্য জায়গায় যেমন এক্ষেত্রেও তেমনই শ্রমিকদিগকে পেটে পাথর বাঁধিয়া কাজ করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। রেল আইনকে অগ্রাহ্য করিয়া, পে কমিশনের রায়ের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া কংগ্রেসী নেতারা তাঁহাদের খেয়াল খুসী বশেই বি, এস ম্যান ও সুইচ ম্যানদের অর্দ্ধ দক্ষ পর্য্যায়ে ফেলিয়াছেন এবং তাহাদের মাহিনার হার স্থির করিয়াছেন ৩৫৲-১-৫০৲-২-৬০৲ টাকা। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম যেখানে ৪ হইতে ৫ গুণ বাড়িয়াছে যুদ্ধ পূর্ব্ব দামের তুলনায় সেখানে বি, এস, ম্যান ও সুইচম্যানরা পূর্ব্বের তুলনায় ৬ বেশী পাইলেন। এই ঘোর অবিচার রেলের উচ্চ কর্ম্মচারীদের চোখে পর্য্যন্ত ঠেকিয়াছে তাহার প্রমান পাওয়া যায় হাওড়া ও শিয়ালদহের ডি, এস, রা ই, আই, আরের জেনারেল ম্যানেজারকে যে চিঠিতে জানাইয়াছিলেন, বি, এস, ম্যান ও সুইচ ম্যানরা তৃতীয় শ্রেণীর দক্ষ শ্রমিক; ইহারা এ, এস, এমদের সমতুল্য কাজ করেন এবং স্বাধীনভাবে ট্রেনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রন করেন তাহা হইতে। সুতরাং ইঁহাদের বেতন এ, এস, এমদের মতই হওয়া উচিত। অথচ না আছে আজ পর্য্যন্ত সে চিঠির কোন জবাব না আছে অন্য কিছু। রেলওয়ে বোর্ডের চিফ কমিশনার বড়লাট বাহাদুর শ্রীরাজাগোপাল আচারী এবং রেলমন্ত্রী শ্রীশান্তনম ও ও গোপালস্বামী আয়েঙ্গারের দৃষ্টি এবং পণ্ডিতজীর দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট করিয়াও কোন জবাব মিলে নাই। সরকার পক্ষ নির্ব্বাক ও নিরুত্তর।

এই অবস্থার প্রতিকার একমাত্র ধর্ম্মঘটের সফলতার মধ্য দিয়া হইতে পারে—এ কথা বি, এস, ম্যান ও সুইচ ম্যানরা জানেন বলিয়া তাঁহারা ধর্ম্মঘটের সফলতার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

—০—

মৌভাণ্ডার মজদুর ইউনিয়নের সাধারন সভায়

বিদেশী মালিকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রস্তাব গৃহিত

রাউপিলা—গত ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে মৌভাণ্ডার ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশন মজদুর ইউনিয়নের এক সাধারণ সভা হয়। উক্ত সভায় সর্ব-সম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত প্রস্তাবটি গৃহিত হয়—"রোলিং মিলের শ্রমিকরা রীতিমত উৎপাদন করিতেছেন। এই অজুহাতে কোম্পানী শ্রমিকদিগকে জব্দ করিবার জন্য যে চেষ্টা করিতেছে ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশন মজদুর ইউনিয়নের এই সাধারণ সভা তাহার তীব্র নিন্দা করিতেছে এবং ইহার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলন চালাইবার জন্য প্রত্যেক শ্রমিককে আহ্বান করিতেছে।" এই সভার কয়েকদিন পূর্ব্বে ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাত করেন এবং শ্রমিকদের দাবীদাওয়া বিষয়ে আলোচনার সময় জানান যে মজুরদের মজুরী বৃদ্ধি করিলেই তবে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে পারে; খালি পেটে রাখিয়া উৎপাদন বাড়াইবার কথা বলা নিরর্থক। ইহার উত্তরে ম্যানেজার সাহেব বলেন যে তাহারা ব্যবসা করিতে আসিয়াছে দান খয়রাত করিতে নয়; সুতরাং আধ পয়সাও মজুরী বাড়িবে না। ঐ দিনই কোম্পানী সরকারের শরণ লয় এবং সরকার পক্ষের হইয়া মহকুমা হাকিম ইউনিয়নকে হুমকি দিয়া এই মর্ম্মে একটি চিঠি দেয় যে, তিনি বিশ্বস্ত সূত্রে জানিয়াছেন শ্রমিকরা ইচ্ছা করিয়া রেলিং মিলে উৎপাদন হ্রাস করিতেছে; ইহা কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্পনীতির বিরোধী। সুতরাং যদি ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখ হইতে পুরা উৎপাদন না হয় তাহা হইলে সরকার জোর করিয়া কাজ আদায় করিতে বাধ্য হইবে এবং উক্ত ব্যাপারে জড়িত ৫ জন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করিবে। ইউনিয়নের উপরিউক্ত সাধারন সভায় ইহা ঠিক হয় যে যদি সরকার পক্ষ মালিকের হইয়া গরীব শ্রমিকদের উপর জুলুম চালায় তাহা হইলে তাহারা ধর্ম্মঘট করিবে। স্থানীয় ইউনিয়নের এই প্রস্তাব অনুমোদন করিবার জন্য সভাপতি মিঃ মাইকেল জনের (আই, এন, টি, ইউ, সি,) নিকট পাঠাইলে তিনি ৬ই ফেব্রুয়ারী মৌভাণ্ডারে এক সাধারন সভা করেন এবং শ্রমিকদিগকে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কাজ করিয়া যাইতে উপদেশ দেন। শ্রমিদের ঐক্য ও সংস্কৃতি নষ্ট করিবার জন্য উক্ত সভা আই, এন, টি, ইউ, সির সংগঠক সম্পাদক হাসানৎ চৌধুরী শ্রমিক স্বার্থের কথা বাদ দিয়া প্রদেশিকতা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে কয়েক জন শ্রমিক বিরক্ত হইয়া প্রতিবাদ করেন এবং সমস্ত শ্রমিকরা সভা ত্যাগ করিবার জন্য উঠিয়া পড়েন। আই, এন, টি, ইউ, সির দালালীতে শ্রমিকরা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

—: ০ :—

ছাঁটাইএর মুখে সেণ্ট্রাল পি-ডবলিউ-ডি শ্রমিক ও কেরাণী

সি-পি-ডবলিউ-ডি সিন্ধ্রির সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রীতিশ চন্দের বিবৃতি

কংগ্রেসী নেতাদের মতে শ্রমিক ছাঁটাই হইল বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ রক্ষা

সেণ্ট্রাল পি, ডবলিউ ডির মজদুর ইউনিয়ন, সিন্ধ্রির সাধারণ সম্পাদক শ্রীপ্রীতিশ চন্দ সি, পি, ডবলিউ ডির মজদুরদের দুরবস্থা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিশেষ বিভাগের মজদুরদের উপর ঔদাসিন্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন ঃ—

সকলেই জানেন যে সেণ্ট্রাল পি-ডবলিউ-ডির মজুররা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ও ওয়ার্কস মাইনস পাওয়ার্স বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় ডাঃ গ্যাডগিলের প্রত্যক্ষ অধীনে কাজ করেন। সমস্ত স্থানের সরকারী (কেন্দ্রীয়) দপ্তর বাসস্থান প্রভৃতি তৈয়ারী করা এবং তত্ত্বাবধান করা, ইলেকট্রিক সাপ্লাই, পাওয়ার হাউস, জল সরবরাহ প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ এই মজদুররা করেন। কেন্দ্রীয় সরকার এবং জনসাধারণের উভয়ের পক্ষেই এই বিভাগের মজুররা বিশেষ প্রয়োজনীয় বিশেষ করিয়া ইঁহাদের উপর যখন অনেক খানি পরিমাণে জল এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ নির্ভর করে।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্ল্যান অনুযায়ী সিন্ধ্রির সি-পি-ডবলিউ ডির মজুররা বিশেষভাবে নিজেদের নিয়োগ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প-বিভাগ এবং W. M. P. বিভাগ এই Project এর কাজ দেখিতেছেন। তাঁহারা জানেন কত বড় কঠিন দায়িত্ব এই মজদুরদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। অথচ এই বিভাগের মজুররা আজ ভীষণ রকম দুরবস্থায় ভুগিতেছেন। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার ইহাতে সম্পূর্ণ উদাসীন রহিয়াছেন। মজুরদের ন্যূনতম ও ন্যায়সঙ্গত দাবীদাওয়া তাঁহাদের কানে পৌঁছিতেছে না। উপরন্তু সেণ্ট্রাল পি, ডবলিউ, ডির মজুরদের সামনে আজকে সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়াছে ছাঁটাই সমস্যা। কেন্দ্রীয় সরকার ভীষণ ভাবে ছাঁটাইয়ের হুমকি দিয়াছেন, ইতিমধ্যেই এই বিভাগের বহু কর্ম্মচারী বিভিন্ন স্থানে ছাঁটাই হইয়াছে এবং আরও ছাঁটাই চলিবে বলিয়া জানা গিয়াছে। এমন কি Regular staff দেরও ছাঁটাই করা হইতেছে। অথচ এই বিভাগে কাজ আছে প্রচুর। Fertiliser Project এ বহু কাজ আছে এবং লোকের প্রয়োজনও আছে। অন্যান্য বহু স্থানেও সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ সুরু হইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা আছে অথচ শিল্পের প্রধান অঙ্গ মজুর—তাহাদেরই ছাঁটাই করা হইতেছে।

মাননীয় মন্ত্রী গ্যাডগিলকে ছাঁটাই বন্ধ করিবার জন্য ইউনিয়নের তরফ হইতে আবেদন করা হইয়াছিল। তিনি জানাইয়াছেন যে, "জাতীয় সরকারের বৃহত্তর স্বার্থের প্রয়োজনে মজুর ও কর্ম্মচারী ছাঁটাই করিতে হইবে। আমরা ইউনিয়নের তরফ হইতে জানাইয়াছি যে জাতীয় সরকারের কোন বৃহত্তম স্বার্থের মজুর ছাঁটাই হইবে বুঝিতে পারিলাম না। জাতীয় সরকারের বৃহত্তর স্বার্থ, যদি হয় দেশের শিল্পোন্নয়ন, শ্রীবৃদ্ধি, জনসাধারণের জন্য শান্তি আনা তবে সেই স্বার্থে মজুরকে কাজে নিয়োজিত করাই ত' প্রধান কাজ—জনসাধারণকে বাঁচাইয়া রাখাই প্রধান দায়িত্ব। শিল্পোন্নয়ন মানেই কলকারখানা তৈয়ারী করা—নূতন নূতন Industry গড়িয়া তোলা—তাহাতে মজুর নিযুক্ত করিতেই হইবে। তবে মজুর ছাঁটাই কেন? বিশেষ করিয়া যেখানে বর্ত্তমানে কাজ চালাইবার জন্যই বহু মজুরের দরকার। বর্ত্তমান অবস্থায় এক জন মজুর ছাঁটাই করা মানে তাহার সাথে সাথে প্রতি মজুর পরিবারের ৭ জন লোককে নিঃস্ব করা, ভিক্ষুকে পরিণত করা—ইহাই কি জাতীয় স্বার্থ?

সেণ্ট্রাল পি-ডবলিউ-ডির মজুররা সরকারী কর্ম্মচারী হওয়ায় পে-কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সুদক্ষ মজুরদের ৬০৲ (ষাট) টাকার নিম্নে মাহিনা হইতে পারে না এবং দক্ষ মজুরদের জন্য ৬০৲ হইতে ১০৫৲ টাকা এবং উচ্চ দক্ষ (highly skilled) মজুরদের জন্য ১২০৲ হইতে ১৮০৲ টাকা মাহিনা পে কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী হওয়া উচিত। অথচ সেণ্ট্রাল পি-ডবলিউ-ডির দক্ষ মজুরকে এই হারে মাহিনা পাইতেছেন না এবং বহু ক্ষেত্রে দক্ষ মজুররা আজও ৪০৲ টাকা বেতন পাইতেছেন না।

পে-কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বর্ত্তমান মূল্যমান অনুযায়ী (পে কমিশনের সময় ১৯৪৬) প্রতি মজুর, মাগগীভাতা ৬০৲ করিয়া পাইবে এবং মূল্যমানের প্রতি দশ পয়েণ্ট বৃদ্ধিতে ২ টাকা ৮ আনা করিয়া মাগগীভাতা পাইবে ও কিন্তু সেণ্ট্রাল পি-ডবলিউ-ডির মজুররা এই হারে মাগগীভাতা পাইতেছেন না—W. C. Staff রা ৩৫৲ টাকা করিয়া মাগগী-ভাতা পাইতেছেন। এই স্থানে উল্লেখযোগ্য যে এই সেণ্ট্রাল পি, ডবলিউ, ডির উচ্চ স্থানীয় কর্ম্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি, ঘুষ খাওয়া, চুরি করা ইত্যাদি অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার—এই সব দুর্নীতির কথা সরকারও জানেন। উচ্চ কর্ম্মচারীদের Nepotism এবং Favouritism এর জন্য সাধারণ মজুররা লাঞ্ছিত হয়—কিন্তু সরকার উচ্চ কর্ম্মচারীদের দুর্নীতি ও নিম্ন কর্ম্মচারীদের প্রতি লাঞ্ছনা বন্ধ করিবার দিকে শুধু কাগজী নির্দ্দেশ জারী করা ছাড়া আর কিছুই করিতেছেন না আর সাধারণ মজুরদের জাতীয় সরকারের বৃহত্তর স্বার্থের নামে শোষিত, লাঞ্ছিত হইতে দিতেছেন।

তাই আমরা সেণ্ট্রাল P. W. D মজুর ইউনিয়নের (সিন্ধ্রি) তরফ হইতে সরকারকে অবিলম্বে মজুরদের ন্যায়-সঙ্গত ও ন্যায্য দাবীদাওয়া মিটাইতে অনুরোধ করিতেছি—দেশবাসীর কাছে অনুরোধ করিতেছি যে স্বাধীন দেশে জল সরবরাহকারী, বিদ্যুৎ সরবরাহকারী এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য্যে নিযুক্ত এই সব মজুরদের দাবীদাওয়া সমর্থন করিয়া জাতীয় সরকারকে জানান যেন এই দাবীদাওয়া মেটান হয়।

আমাদের প্রধান দাবীদাওয়া গুলির মধ্যে কয়েকটি নিম্নে দেওয়া হইল,

(১) অবিলম্বে ছাঁটাই বন্ধ করিতে হইবে এবং যাহাদের ছাঁটাই করা হইয়াছে তাহাদের পুনরায় নিযুক্ত করিতে হইবে।

(২) Semi Permanent দের Permanent এবং ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসের পর যাহাদের দুই বৎসর চাকুরী হইয়াছে তাহাদের Semi Permanent অথবা Permanent করিতে হইবে।

(৩) পে-কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী মাহিনা এবং মাগগী-ভাতা দিতে হইবে।

(৪) ছুটি প্রভৃতি ব্যাপারে অন্যান্য কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের ন্যায় সুযোগ সুবিধা দিতে হইবে।

(৫) প্রত্যেক মজুরকে থাকিবার মত বাসস্থান বা কোয়ার্টার দিতে হইবে।

[এস্থানে উল্লেখযোগ্য যে সিন্ধ্রি সম্পূর্ণ নূতন ভাবে একটি সরকারী কলোনী হিসাবে গড়িয়া উঠিতেছে; এখানে কোন বাড়ী বা ঘরভাড়া পাওয়া যায় না। সুতরাং সরকার মজুরদের কোয়ার্টার না দিলে তাহাদের পাহাড়ে দেশে রাস্তায় থাকিতে হয়।]

ডোঙ্গাজোড়ায় কৃষক আন্দোলন

২৪ পরগনা জেলার জয়নগর থানার অন্তর্গত ডোঙ্গাজোড়া গ্রামের চাষীদের উপর গত মে মাসে যে পুলিশী জুলুম চলিয়াছিল তাহাতে ৪ জন নিহত এবং বহুলোক আহত হন। গ্রামবাসীরা জমিদারকে গ্রাম হইতে ধান লইয়া না যাইয়া ন্যায্যমূল্যে তাঁহাদের মধ্যে বিক্রয় করিবার অনুরোধ করিলে প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার মহাশয় স্থানীয় পুলিশ ও কিছু অস্ত্রধারী পুলিশ লইয়া জোর করিয়া ধান আনিতে চাহিলে গ্রামবাসীরা বাধা দেন; ফলে ঐ গুলিচলে। তাহার পর হইতে নিত্যনব পুলিশি ও জমিদারী জুলুম কৃষকদের উপর চলিতেছে এবং বর্ত্তমানে ৮৫ জনের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হইয়াছে। ইহাতেও কৃষকদের মনোবল কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয় নাই। গত ১২ই জানুয়ারী তারিখে একটি কৃষক মিছিল বাহির হয় এবং অনেকগুলি গ্রাম প্রদক্ষীন করিয়া ডোঙ্গাজোড়ায় ফিরিয়া আসে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই ঘটনার পর জমিদার, জোতদারের দল, স্থানীয় ও টাউন কংগ্রেসের কর্ত্তা ব্যক্তিরা এবং পুলিশ লালজুজুর ভয় দেখাইয়া কৃষকদিগকে বোঝাইতে চাহিলে তাঁহারা তাহাদের কথা না শুনিয়া চলিয়া যান এবং পরে আর একটি মিছিল বাহির করিয়া ইহার যোগ্য উত্তর দেন।

—০—

পশ্চিমবাংলা সরকারের করনীতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরও সর্বভারতীয় কংগ্রেসী নেতা হতে প্রাদেশিক স্তরে নেতারা পর্য্যন্ত তার স্বরে চীৎকার করে বলেছিলেন—শিক্ষাই হল জাতিকে গড়ে তোলার একমাত্র উপায়, শিক্ষা ব্যবস্থাকে নূতন করে গঠন করতে হবে আর এত গলা-বাজীর পর জনসাধারণ দেখল শিক্ষা-ব্যবস্থা পালটান দূরে থাকুক, বিনা খরচে প্রাথমিক শিক্ষা পাবার সুবিধার ব্যবস্থা চালু হওয়া দূরে থাকুক কুখ্যাত লীগ আমলে বাংলার মোট রাজস্বের যে অংশ শিক্ষাখাতে ব্যয়িত হত কংগ্রেসী সরকারের আমলে তা গেল আরও কমে। মোট রাজস্বের শতকরা ৯ ভাগ শিক্ষাখাতে খরচ করত পরাধীন সাম্প্রদায়িক লীগমন্ত্রীসভা আর স্বাধীন কংগ্রেসী মন্ত্রীরা তাকে টেনে এনে দাঁড় করল শতকরা ৬ ভাগে। সুতরাং আয় বাড়লেই যে জনহিতকর গঠনমূলক পরিকল্পনায় বেশী খরচ করা হবে পুঁজিবাদী দেশে সে রকম নিয়ম নেই। পুঁজির একমাত্র লক্ষ্য হল মুনাফা শিকার। এই মুনাফা শিকারকে ব্যাপক করার জন্য জনসাধারণকে নির্ম্মমভাবে শোষণ করতে হয়। তাই পাছে জনসাধারণ এই নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে সেই ভয়ে রাজস্বের বেশীর ভাগ অংশই ব্যয়িত হয় পুলিশ বিভাগ ও মোটা বেতনের কর্ম্মচারী পোষায়। অর্থের অভাব তখন হয় না, অর্থের অভাব হয় জনহিতকর কাজ করার বেলায়। মন্ত্রীরা এই ধাপ্পাবাজীর জোরেই জনসাধারণকে ভুল বুঝিয়ে রাখতে চেষ্টা করে।

আশ্রিত পালন আর মোটা বেতনের আমলাদের পেছনেই রাজস্বের সব অর্থ যায়

দেখা গেল শিক্ষাখাতে সরকারী ব্যয় কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, জনস্বাস্থ্য বিভাগের ও সেই এক দশা, কোন জন উন্নয়ন কিংবা জাতি গঠন মূলক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হয় নি। বাজেটে এদের জন্য মোটা টাকা বরাদ্দ করিলেও বাস্তবের মুখ আজও দেখল না পরিকল্পনা গুলি। বিপুল সরকারী ব্যয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা কমিটি দিয়ে পরিকল্পনা গুলি রচিত হবার পর তাদের স্থান হয়েছে পুরান ফাগজ পত্রের সঙ্গে। হয়ত যদি কোন দিন প্রয়োজন পড়ে তাহলে তাদের উদ্ধার করাই সম্ভব হবে না আর সম্ভব হলেও দেখা যাবে তারা backdated হয়ে গিয়েছে কাজে আসবে না। এই করেই পরিকল্পনার পাহাড় রচিত হচ্ছে জনসাধারণের বুকের রক্তে অর্জিত অর্থে। জন-সাধারণকে ধাপ্পা দিয়ে আশ্বস্ত করার কাজে সরকারী প্রচার বিভাগ ব্যস্ত হয়ে উঠে আর জন হিতকর কাজে বাজেটে বরাদ্দ টাকা উপদলীয় প্রাধান্য রক্ষার কাজে, আশ্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে, আর মোটা বেতনের কর্ম্মচারীদের পেছনে খরচ করা হয়—এই হচ্ছে কংগ্রেসী উন্নয়ন পরিকল্পনার গতি। বাজেটের খরচের দিকে লক্ষ্য করলেই এর প্রমান মিলবে।

অবিভক্ত বাংলায় চীফ সেক্রেটারী, সেক্রেটারী, জয়েণ্ট সেক্রে-টারী, অতিরিক্ত সেক্রেটারী প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর সংখ্যা যেখানে ছিল ১৯ জন আজ পশ্চিম বাংলায় আয়তন ও লোক সংখ্যা পূর্ব্বের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ হওয়া সত্ত্বেও তা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৩১ জনে। দক্ষ কর্ম্মচারীর সংখ্যা বাড়ায় যেখানে শাসন কার্য্যে উন্নতিই আশা করা সেখানে জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশা ক্রমে বেড়েই চলেছে ; সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি উগ্রভাবে বিরাজ করছে। এ অবস্থা হতে বাধ্য, কারণ চালকেরাই দুর্নীতির উর্দ্ধে নেই। সংবাদে প্রকাশ সরকারী প্রেস নিয়ন্ত্রণী কাজের জন্য ১৩ টি পদের জন্য কয়েক হাজার দরখাস্ত বাদ দিয়ে যা দাঁড়ায় তার মধ্যে ৭ টি পশ্চিম বাংলার প্রধান-মন্ত্রী, ৫ টি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, ৩ টি পূর্ত্ত-বিভাগের মন্ত্রী (বর্ত্তমানে অস্থায়ী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) ৯ টি কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প মন্ত্রী আরও মাতব্বর ব্যক্তিদের দ্বারা বিশেষ ভাবে recommended। ১৩ টি পদে তাঁদের মধ্যে বোঝাপড়ার মারফৎ লোক নিয়োগ করা হবে তা তাঁরা কর্ম্মক্ষম হন আর না হন। উপদলীয় স্বার্থ এই ভাবেই পালন করা হচ্ছে।

বাংলার লাট বাহাদুরের খরচ অবিভক্ত বাংলায় ১৯৪৫ সালে ছিল ১০,১৫৮,৯০৲ টাকা আর তার এক তৃতীয়াংশ ভাঙা বাংলায় ১৯৪৮-৪৯ সালে তা হল ৬, ৪২, ০০০৲। কংগ্রেসী লাট বাহাদুররা কম খরচ করবেন এই প্রতিশ্রুতির কথা ছেড়ে দিলেও ইংরেজ লাটের খরচের অনুপাতে এঁর হওয়া উচিত ছিল ৩,৩৮,০০০৲ টাকা। লাট সাহেবের পর মন্ত্রীদের কথা ধরা হ'ক। ১৯৪৬-৪৭ সালে মন্ত্রীদের জন্য খরচ ছিল ৫, ৯৯, ৮০০ টাকা ১৯৪৮-৪৯ সালে তা হয়েছে ৩, ৮৬,০০০ টাকা, হওয়া উচিত ২,০০,০০০। সেক্রেটারীদের জন্য আগে খরচ হয়েছিল ৩৮,৭২,২২৮৲ এখন হয়েছে ৩৫,২০,০০০৲ বোর্ড অফ রেভিনিউ য়ে আগে হত ২, ২৫,০৬০ বর্ত্তমানে ২,৫৬,২০০৲ টাকা। বাংলা ভাগ হবার পর স্বরাষ্ট্র বিভাগে ৩,৩৯,৯০০৲ অর্থ-বিভাগে ২৪৪৮০০৲ ও প্রচার বিভাগে ২৮০৫০২৲ টাকা বেশী খরচ বরাদ্দ করা হয়েছে অবিভক্ত বাংলার বাজেটে বরাদ্দের তুলনায়। সুতরাং মোটা মোটা মাইনের শ্বেত হস্তি পোষার খরচ মেটানই এবং দলগত প্রচার চালনই পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসী সরকারের একমাত্র নীতি একথা বোঝার কোন অসুবিধা নেই।

বাঁচার উপায়—মহল্লায় মহল্লায় আন্দোলন কমিটি গঠন ও আন্দোলন

দেশের নিরন্ন বিবস্ত্রপ্রায় জনসাধারণের অর্থের এই রকম অপব্যয় জনসাধারণ সহ্য করতে পারে না। নিজের মুখে রক্ত তুলে হাড় ভাঙা পরিশ্রম করেও দেশের অধিকাংশই আজ রোগে ঔষধ, পথ্য, পরণে কাপড় মুখে অন্ন জোটাতে পারছে না তার ওপর এই নতুন করভারে জনসাধারণের অবস্থা যে কি ভীষণ শোচনীয় হবে তা বলে বোঝাবার দরকার নেই। সুতরাং এই বিলকে কার্য্যকরী হতে দেওয়ার অর্থ নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনা। শুধু তাই নয় পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থার ধারাই এই যে দিনের পর দিন করভার বেড়েই চলে জন-সাধারণের উপর আর পুঁজিপতিদের লাভের অঙ্কে হাত দেওয়া হয় না। পশ্চিম বাংলা সরকারের ব্যবহারে ও তার প্রমান মিলবে। স্থির হয়েছিল শিল্পজাত পাটের দ্রব্যাদির ওপর ট্যাক্স বসিয়ে পশ্চিম বাংলা সরকার কয়েক কোটী টাকার মত রাজস্ব তুলবে কিন্তু যেহেতু তা পুঁজিপতি শ্রেণীর গায়ে লাগার সম্ভাবনা বেশী সেহেতু সে কথা বেমালুম চেপে গিয়ে রায় মন্ত্রী মণ্ডলী করভারে মৃতপ্রায় জনসাধারণের ঘাড়েই নতুন কর চাপিয়েছেন। এই প্রাণান্তকর অবস্থা ততদিন চলবে যতদিন পুঁজিবাদী শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে আর অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হবে শোষণকে নির্ব্বিবাদে মেনে নিলে। সুতরাং প্রকৃত জনরাষ্ট্র কায়েম না করতে পারলে স্থায়ী মুক্তি আসবে না। কিন্তু তার জন্য চূড়ান্ত সংগ্রাম করতে হবে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সঙ্গে। সেই সংগ্রামের জন্য জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী গণফ্রন্ট দরকার, পুঁজিবাদ বিরোধী নেতৃত্ব দরকার। স্থানীয় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাকে গড়ার চেষ্টা করতে হবে। আজ যে সর্বনাশকর কর পশ্চিম বাংলার অধিবাসীকে পিষে ফেলতে উদ্যত হয়েছে তাকে রুখবার জন্য মহল্লায় মহল্লায় সংগ্রামী জনতার কমিটি গঠন করুন, নিয়ত প্রচার চালান এই কর-স্থাপনের বিরুদ্ধে, সারা বাংলায় এর ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে সাহায্য করুন। এরই মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে শেষ লড়াই এর নেতৃত্ব, সাংগঠনিক প্রস্তুতি আর সংগ্রামী গণফ্রন্ট।

মুসাবনী তাম্রখনির শ্রমিকদের উপর জুলুম

ঘাটশিলা—

বহুদিন যাবত মুসাবনী তামার খনির মজুরদের উপর বিদেশী মালিক অত্যাচার চালাইয়া আসিতেছে। কথায় কথায় শ্রমিকদিগকে বরখাস্ত, সতর্ক, জরিমানা প্রভৃতি করা হয়। স্থানীয় ইউনিয়ন আই-এন-টি-ইউ-সির অধীনে। ইউনিয়নের নেতাদের অহেতুক এই সব জুলুমের কথা বলিলে তাঁহারা কই করিয়া আরও দশ বৎসর কাজ করিয়া যাইতে উপদেশ দেন কারণ তাহার পর নাকি বিদেশী কেম্পানী চলিয়া যাইবে এবং দেশীয় কর্তৃত্বাধীন আসিলে সকল দুঃখের নাকি অবসন্ন ঘটিবে। ইউ-নিয়নের নেতাদের এই সব কথায় সাধারণ শ্রমিকরা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়াছে এবং ইউনিয়নের নেতৃত্বের প্রতি কোন আস্থাই নাই। কয়েকদিন পূর্ব্বে খনির বানালপা বিভাগে রাত্রিতে মজুরদের সর্দ্দার কুলীমজুরদের কাজ দেয় এবং তাহা করাইয়া লইবার পর তাহা-দিগকে বিশ্রামের ছুটী দেয়। সেই মত তাহারা যখন বিশ্রাম লইতেছিল তখন অবসর বুঝিয়া সর্দ্দার তাহাদের কাজের জিনিষ সরাইয়া রাখে এবং কোম্পানীর নিকট নালিশ করে মজুররা কাজ না করিয়া ঘুমাইতেছিল। ইহাতে কয়েকজনকে বরখাস্ত এবং কয়েকজনকে সাসপেণ্ড করা হয়।

—•—

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের কর্ম্মী ধলভূম মহকুমা হইতে বহিষ্কৃত

ধলভূমের মহকুমা হাকিম সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের বিশিষ্ট সভ্য এবং বিহারের শ্রমিক নেতা কমরেড হিরেন সরকারের উপর এই মর্ম্মে এক আদেশ জারি করিয়াছেন যে মৌভাণ্ডার ও মুসাবনী শ্রমিকদের ও অধিবাসীদের সহিত মেলামেশা ও তাহাদিগকে নিজ দলভুক্ত করিয়া অশান্তি সৃষ্টি করিবার জন্য তাঁহাকে ২৯ শে জানুয়ারী হইতে ২ মাসের জন্য ধলভূম মহকুমার যে কোন স্থলে আসিতে নিষেধ করা যাইতেছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে মৌভাণ্ডার ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশন মজদুর ইউনিয়ন সম্প্রতি যে ধর্ম্মঘটের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল তাহাতে নেতৃত্ব দিতেছিলেন কমরেড হিরেন সরকার।

সম্পাদক—প্রীতিশ নন্দী কর্তৃক আর্ট প্রেস, ২০ বৃটীশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।—কার্য্যালয় ১ এ, একজিবিসন রো, কলিকাতা—১৭